গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ২৪ সংখ্যা | ২৩ - ২৯ জানুয়ারি ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

এই অরাজকতার জন্য বিজেপির রাজনীতি দায়ী

এস আই আর শুরুর সময়ে রাজ্যের বিজেপি নেতা-নেত্রীরা শোরগোল তুলে দিয়েছিলেন যে রাজ্যে ঢুকে পড়েছে দু'কোটি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এস আই আর হলে তারা সব ধরা পড়বে। বিজেপি নেতাদের তারস্বর প্রচারে অনেকেই কথাগুলো বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। তাঁরাও এখানে ওখানে কথাগুলো আওড়াচ্ছিলেন। এখন এস আই আরের প্রথম দফা কেটে যখন 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে প্রায় দেড় কোটি মানুষের শুনানিতে ডাক পড়ছে তখন তাঁরাই রোহিঙ্গা কিংবা বাংলাদেশি খোঁজার কথা ভুলে গিয়ে ভোটার তালিকায় নিজের নাম বাঁচানোর দুশ্চিন্তায় ছুটে বেড়াচ্ছেন। রাজ্যের মানুষ প্রতিদিন দেখছেন, নির্বাচন কমিশন কী ভাবে বয়স্ক, অসুস্থ, এমনকি হাসপাতালে ভর্তি মানুষদেরও শুনানির জন্য টেনে আনছে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখছে। রাজ্য জুড়ে প্রবল গণবিক্ষোভের সামনে পড়ে শেষ পর্যন্ত কমিশন অক্ষম এবং অসুস্থদের ক্ষেত্রে বাড়ি গিয়ে শুনানির নির্দেশ দিলেও তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কমিশনের খাতাতেই থেকে গেছে। মানুষকে লাইনে দাঁড়িয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে। অথচ এটার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

প্রথমে জানানো হয়েছিল, ২০০২-এর ভোটার লিস্টে যাঁদের নাম নেই, বা তাঁর বাবা-মা বা ঠাকুরদা-ঠাকুমারও নাম নেই, যাঁদের ম্যাপিং হয়নি তাঁদের শুনানির জন্য ডাকা হবে। তাঁদের কমিশন নির্ধারিত ডকুমেন্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে তাঁরা ভারতীয় নাগরিক। এর পর হঠাৎ কমিশন নিয়ে এল

এসআইআর-এর নামে নাগরিকদের হেনস্থার প্রতিবাদে ও মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলায় জেলায় এসইউসিআই(সি)-র বিক্ষোভ। ছবি ঃ নদিয়ার দেবগ্রাম, ১৯ জানুয়ারি

চারের পাতায় দেখুন

মহান লেনিন স্মরণে

"পুঁজিবাদের সবচেয়ে ভাল রাজনৈতিক খোলস হল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সে জন্য, পুঁজি এক বার এর দখল নিতে পারলে, এমন দৃঢ়ভাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে, যাতে তা আর পরিবর্তন করা না যায়। কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কোনও পার্টি একে নড়াতে পারে না।

—লেনিন *(রাষ্ট্র ও বিপ্লব)*

জন্ম ঃ ২২ এপ্রিল ১৮৭০
মৃত্যু ঃ ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিল করতে হবে

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ সচিবের সভায় দাবি জানাল বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন

সংখ্যাগরিষ্ঠতা কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদ্ধত্যকে এমন উচ্চতায় তুলেছে যে, সংসদে কোনও আলোচনা ছাড়াই একের পর এক বিল তারা আইনে পরিণত করেছে। তারপর গণআন্দোলনের চাপে কিছু বিল বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। সম্প্রতি বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনগুলির ধারাবাহিক আন্দোলনের সামনে বিল নিয়ে তাদের বক্তব্য শোনার উদ্যোগ নেয় সরকার। গত ১৬ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ সচিব অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) এবং অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইকা)-কে অনলাইন মিটিংয়ে আহ্বান করেছিলেন। মিটিংয়ের আলোচ্য বিষয় ছিল বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল ২০২৫।

অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এআইইসিএ)-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে ভেনুগোপাল ভাট এবং অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (এবিইসিএ)-র পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক সুব্রত

ছয়ের পাতায় দেখুন

জনগণের পার্লামেন্টে গৃহীত হবে জনগণের শিক্ষানীতি

২৪ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোর

কোনও একটি দেশে শিক্ষানীতি কেমন হবে, তা সেই দেশের জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ গ্রহণ করার জন্য ভারতের পার্লামেন্টে কোনও আলোচনা হয়নি। সংসদীয় রীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কোথাও কোনও রকম আলোচনা না করে ২০২০ সালের ২৯ জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই শিক্ষানীতি গ্রহণ ও চালু করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রীসভার যে সদস্যরা এই শিক্ষানীতি ঘোষণা করলেন, তাঁরা কারা? তাঁদের শিক্ষাগত পরিচয় একটু জানা দরকার। এই শিক্ষানীতির খসড়া প্রণয়নকালে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন রমেশ পোখরিয়াল নিশঙ্ক। তিনি পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গর্বের সঙ্গে উচ্চস্বরে বলেছিলেন, 'জ্যোতিষশাস্ত্রের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান তো শিশু'। এটা হল তাঁর আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা। তাঁরই জুনিয়ার মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রকের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী সত্যপাল সিং বলেছিলেন, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব ভুল। প্রমাণ হিসেবে বললেন, 'কেউ কি কখনও কোনও বানরকে লেজ খসিয়ে মানুষ হতে দেখেছে?' মোক্ষম যুক্তিই বটে! সেই মন্ত্রীসভারই আরেকজন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। তাঁর নিজের শিক্ষাগত ডিগ্রি নিয়েই বিতর্ক ছিল। আর এই মন্ত্রীসভার যিনি প্রধান, যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, তিনি তো জ্ঞানের বহরে তাঁর সহ-মন্ত্রীদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, ভারতে বহু প্রাচীনকালেই প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। প্রমাণ হিসেবে বলেছেন, যদি তা না-ই থাকত তাহলে গণেশের ঘাড়ে হাতির মাথা জুড়ল কী করে? ইন্টারনেট না থাকা অবস্থায় তাঁর ই-মেল করা, বা মেঘলা আকাশে রাডারে বিমানের অবস্থান ধরতে না পারার বিদ্যা সম্পর্কেও সেনাবাহিনীকে তাঁর উপদেশ সম্পর্কে দেশবাসী অবগত। শিক্ষাক্ষেত্রের বিজ্ঞান ও জ্ঞানের এই বহর নিয়েই আধুনিক ভারতের শিক্ষানীতি তারা ঘোষণা করলেন।

দুয়ের পাতায় দেখুন

অভয়ার ন্যায়বিচার চাই

'ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ উইমেন'-এর নেতৃত্বে ১৫ জানুয়ারি সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের দাবিতে সিবিআই দপ্তর অভিযান

* সংবাদ আটের পাতায়

জনগণের শিক্ষানীতি নিতে জনগণের পার্লামেন্ট

একের পাতার পর

তবে শিক্ষার বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের জ্ঞানের গভীরতা যাই থাক, অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানের কমতি তাঁদের নেই। কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে কী করে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার বেসরকারিকরণ করা যায়, কীভাবে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাকে ধ্বংস করা যায়, কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের মনন থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা মুছে ফেলা যায়, কীভাবে শিক্ষা পরিচালনায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীয় আধিপত্য কায়েম করা যায় এবং এইসব করতে গিয়ে কীভাবে বেপরোয়া স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিতে হবে, তার নিদান শিক্ষানীতির ছত্রে ছত্রে রয়েছে।

যুক্তিবাদী মন নিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করলেই এই শিক্ষানীতির ভয়ঙ্কর রূপ ও দগদগে ঘা ধরা পড়ে। সেই 'দগদগে ঘা ঢাকতে গিলে করা পাঞ্জাবি' পরার মতো শিক্ষানীতির কিছু ছত্রে 'ভালো কথা'র আবরণ দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষানীতি চালুর পর গত সাড়ে পাঁচ বছরে সেই আবরণ ছিঁড়ে তার সর্বনাশা রূপ আজ সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পৌরাণিক কল্পিত কাহিনীকে ইতিহাসের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আরএসএস-এর মুসলিম বিদ্বেষকে স্থান দিতে গিয়ে মুঘল শাসনকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের নামে বিভিন্ন বিষয়ে শুধু প্রাচীন ভারতের কল্পিত কাহিনীই ঢোকানো হচ্ছে না, বর্তমানেও তাদের বিকৃত ধারণাকেও ঢোকানো হচ্ছে। কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মেলে না বলে এনসিইআরটি-র স্কুলের সিলেবাস থেকে জীববিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ডারউইনের তত্ত্ব বাদ দেওয়া হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের সিলেবাসও ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম ও বৈদিক ম্যাথমেটিক্স-এর নামে এমনভাবে বিকৃত করা হচ্ছে যে, দেশের সেরা অঙ্কশাস্ত্রবিদরা আতঙ্কিত হয়ে সম্মিলিতভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শিক্ষানীতিতে মুখে মাতৃভাষার প্রীতির কথা বলে বাস্তবে মাতৃভাষা এবং ইংরেজি উভয় ভাষারই গুরুত্ব হ্রাস করে জ্ঞান বিকাশের পথকে রুদ্ধ করা হচ্ছে। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষা বাজেটে ব্যাপক কাটছাঁট করা হচ্ছে। সেই কারণে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চরম আর্থিক সংকটে ভুগছে। ফলস্বরূপ শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ, সরকারি শিক্ষার পরিকাঠামোর দৈন্যদশা অত্যন্ত প্রকট। আর শিক্ষাব্যবস্থার এই ভগ্নদশার ফলে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই আজ বেসরকারি শিক্ষার রমরমা চলছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে অভিভাবকদের উপর চাপছে সন্তানদের পড়ানোর জন্য উচ্চহারে ফি যোগানোর দায়। অবশ্য দেশের চিন্তাশীল মানুষের কাছে জাতীয় শিক্ষানীতির সর্বনাশা রূপ তার খসড়া অবস্থাতেই ধরা পড়েছিল। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি সেই খসড়ায় উল্লেখিত সর্বনাশা দিকগুলি তুলে ধরে এই শিক্ষানীতিকে 'শিক্ষার মর্মবস্তু ধ্বংসকারী, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ, বেসরকারিকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের দলিল' হিসাবে অভিহিত করে এই শিক্ষানীতি বাতিল করার দাবি জানিয়েছিল।

গত সাড়ে পাঁচ বছর ধরে এই সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র সেমিনার, কনভেনশন, আলোচনা, বিতর্ক, ধরনা, মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতির মাধ্যমে সেভ এডুকেশন কমিটি দেশব্যাপী একটি শক্তিশালী শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। এই আন্দোলনে হাজার হাজার শিক্ষক অভিভাবক ছাত্র ও শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবীরা একত্রিত হয়েছেন। তাঁদের সম্মিলিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে 'জনগণের শিক্ষানীতি' নামক একটি খসড়া, যা বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষার জন্য একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। এই শিক্ষানীতিতে দাবি করা হয়েছে (১) শিক্ষা প্রদানের প্রধান দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে, (২) কেন্দ্রীয় বাজেটে ১০ শতাংশ ও রাজ্য বাজেটের অন্তত ২৫ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করতে হবে, (৩) শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ সাম্প্রদায়িকীকরণ ও বৈষম্যকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধকরতে হবে, (৪) মাতৃভাষা ও ইংরেজি সারা দেশে এই দ্বি-ভাষা নীতি চালু করতে হবে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরের আকাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তু ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জনগণের শিক্ষানীতির খসড়ায় রয়েছে।

জনগণের পার্লামেন্ট সফল করার আহ্বান নিয়ে ১৩ জানুয়ারি কলকাতার সর্বত্র পথসভা হয়। ছবিতে শিয়ালদহ

সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ যেভাবে জনগণের মতামত ছাড়াই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, জনগণের শিক্ষানীতি তেমন নয়। জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই তা তৈরি করা হয়েছে এবং গত ২২ মে ২০২৫, রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিনে সারা ভারতের ১৮টি রাজ্যের ২২টি শহর থেকে একই দিনে প্রকাশ করা হয়েছে। সেই খসড়ার উপর সর্বস্তরের জনগণের মতামত পাঠাতে আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারতের বিশালতা ও বিশেষ পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সেই শিক্ষানীতি ভারতের ১২টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, যাতে ইংরেজি ভাষা অনুধাবন করতে না পারা মানুষও এই শিক্ষানীতির উপর মতামত দিতে পারেন।

জনগণের মতামত সংগ্রহের জন্য রাজ্যে রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, এলাকায় এলাকায়, জেলায় জেলায় সংগঠিত হয়েছে ছোট বড় মত-বিনিময় সভা। সব মিলিয়ে অসংখ্য মানুষ তাতে সামিল হয়েছেন। অনেকেই বহু মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে অসংখ্য মানুষ ই-মেলে সংশোধনী সংযোজনী পাঠিয়েছেন। সেই সমস্ত মতামতকে সুবিন্যস্ত রূপে সাজিয়ে সংশোধিত খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

দেশের পার্লামেন্টে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ উত্থাপন করেনি। তাই জনগণের শিক্ষানীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য আগামী ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ব্যাঙ্গালোর শহরের রামাইয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অ্যাপেক্স অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে জনগণের পার্লামেন্টঅধিবেশন। সেখানে সমবেত হবেন দেশের সব রাজ্যের জনগণের সহস্রাধিক প্রতিনিধি এবং দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীরা। জনগণের শিক্ষানীতি গৃহীত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির কাছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার রূপায়ণের দাবি উত্থাপন করা হবে। স্বাধীন ভারতে শিক্ষা আন্দোলনের এ এক গৌরবময় ও অভিনব রূপ।

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশের প্রকৃত জ্ঞানের শক্তি নিহিত থাকে জনগণের শিক্ষার মধ্যে। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ চালু করে সেই শিক্ষা থেকে দেশের কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চিত করার অভিসন্ধি নিয়ে চলছে। তাই সময় এসেছে এই বিষয়ে এখনই কিছু করার। যেভাবে একদিন শিক্ষা মানবসভ্যতাকে গড়ে তুলেছে এবং তাকে রক্ষা করে এসেছে সেই শিক্ষা আজ আক্রান্ত। তাকে রক্ষা করা আজ আমাদের কর্তব্য। জনগণের পার্লামেন্টকে সর্বাত্মকভাবে সফল করে তুলবার জন্য অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছে।

জীবনাবসান

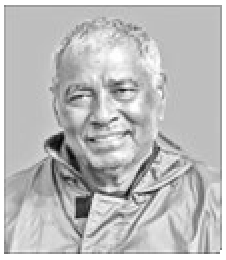

পূর্ব বর্ধমান জেলায় এসইউসিআই(সি) কাটোয়া লোকাল কমিটির অন্তর্গত কেতুগ্রাম থানার আবেদনকারী সদস্য কমরেড রাধাশ্যাম মণ্ডল ৬ ডিসেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। ১৯৮৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন তিনি। এরপরেই দলের সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এলাকায় দলের কাজ শুরু করেন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় বহু মানুষ আকৃষ্ট হতেন। অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেও অন্য রাজনৈতিক দলের নানা সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন তাঁকে কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

১৯৮৮ সালে প্রথম পার্টি কংগ্রেসের সময় তিনি দলের আবেদনকারী সদস্য হন। কঠোর দারিদ্রের মধ্যেও তিনি প্রতিনিয়ত হাসিমুখে দলের কাজ করে গিয়েছেন। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যদেরও দলের সাথে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। গ্রামীণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা প্রতিকারের জন্য তিনি সদাসচেষ্ট ছিলেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে বৃত্তি পরীক্ষা চালু হলে সে ক্ষেত্রেও তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি হৃদরোগ ও শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তখন দলের কাজে সক্রিয় ভাবে থাকতে পারতেন না বলে আক্ষেপ করতেন। প্রবল অসুস্থতার মধ্যেও তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত ব্রিগেডের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

তিনি গণদাবী ও দলের বইপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এবং নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন রাখতেন। দলের কর্মীদের কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি দেখলে দুঃখ পেতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নেতৃত্বকে জানিয়ে সেই কর্মীটিকে ত্রুটি মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানাতেন। কমরেড মণ্ডল এলাকায় জনপ্রিয় ছিলেন তাঁর অমায়িক ব্যবহার, মানবদরদি মন ও অমলিন হাসির জন্য। তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলের কর্মীরা ছাড়াও বহু সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহ স্থানীয় ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং গোটা গ্রাম ঘোরানো হয়।

কমরেড রাধাশ্যাম মণ্ডল লাল সেলাম

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার পূর্বতন কালীগঞ্জ লোকাল কমিটির অন্তর্গত মাটিয়ারী ফরিদপুর অঞ্চলের কমরেড তপন মোদক ১১ ডিসেম্বর কাটোয়া হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

১৯৭৫-এ তিনি কমরেড দুলাল ভট্টাচার্যের মাধ্যমে তৎকালীন ইউটিইউসি(লেনিন সরণি) অনুমোদিত কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র তৈরির শ্রমিক সংগঠন মাটিয়ারী মেটাল ওয়ার্কার্স (রোলিং) ইউনিয়ন গঠন করেন। সেই ইউনিয়নে তিনি অনেক শ্রমিককে যুক্ত করেন। ১৯৭৬ থেকে তিনি দলের কাজ শুরু করেন। ১৯৮০-তে মাটিয়ারী মুসলিম পাড়ায় এক ব্যক্তির খুনকে কেন্দ্র করে পুলিশ এলাকার সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক অত্যাচার চালালে দলের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কমরেড তপন মোদক লাগাতার দু'মাস এলাকায় রাত পাহারা দিয়ে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ান। ১৯৮৩-তে কৃষ্ণনগরে বাসভাড়া বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি ১৮ দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। সে বছরই দেবগ্রাম চৌরাস্তায় আবার বাসভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৮৭-তে দলের প্রথম পার্টি কংগ্রেসের আগে তিনি আবেদনকারী সদস্যপদ পান। দলের পরামর্শে কমরেড দুলাল ভট্টাচার্যের উদ্যোগে তিনি একটি শ্রমিক সমবায় কারখানা গড়ে তুলতে ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০১০ সালের পর শারীরিক অসুস্থতার জন্য কাজ করতে না পারলেও দলের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা।

৪ জানুয়ারি মাটিয়ারী আশীর্বাদ লজে কমরেড তপন মোদকের স্মরণসভা হয়। বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স, নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার কো-অর্ডিনেটর কমরেড হররোজ আলী সেখ, কমরেড কামালউদ্দিন ও অন্যান্যরা।

কমরেড তপন মোদক লাল সেলাম

ইডি তল্লাশি ও তৃণমূল-বিজেপি ভোট কৌশল

তৃণমূলের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের কলকাতা অফিস ও তার মালিকের বাড়িতে, কেন্দ্রীয় আর্থিক তদন্তকারী সংস্থা ইডির অভিযান এবং তাকে ঘিরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক শীর্ষ স্থানীয় প্রশাসনিক ও পুলিশ কর্তার অতি সক্রিয়তা নিয়ে কিছুদিন ধরে হইচই চলছে। দুই জায়গাতেই তল্লাশি চলাকালীন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ঢুকে গিয়ে একাধিক ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসছেন, সে দৃশ্য এতদিনে কয়েক শত বার রাজ্যের মানুষ দেখে ফেলেছেন।

ইডির অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি কয়লা উত্তোলন ও তার বিক্রির মাধ্যমে যে ২০ হাজার ৭৪২ কোটি টাকার দুর্নীতি চলেছে তার ২০ কোটি টাকা হাওলার মাধ্যমে আইপ্যাকের সূত্রে লেনদেন হয়েছে। এই আইপ্যাক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের পরামর্শদাতা শুধু নয়, তাদের দলের সমস্ত স্তরের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে সরকার পরিচালনায় দলের নীতি, ভোট মেশিনারি ইত্যাদি সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ পর্যন্ত এই সংস্থাই ছিল গুজরাটে বিজেপির মুখ্য পারামর্শদাতা। অবশ্য পোশাকি নামে পরামর্শদাতা বলে ডাকলেও আসলে এখন বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস থেকে শুরু করে নানা রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে এই ধরনের সংস্থাগুলিই দলের হয়ে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক কাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

ফলে আইপ্যাক সংস্থার অফিস ও মালিকের বাড়িতে ইডি তল্লাশি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, তাঁর দলের তথ্য হাতাতে এসেছিল কেন্দ্রীয় সংস্থা। দলীয় স্বার্থ রক্ষা দলের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীর মাথাব্যথার কারণ হলেও মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ স্থানীয় আমলা ও পুলিশ কর্তাদের দায়ও কি সেটাই ছিল? তাঁরা দলীয় ফাইল রক্ষার কাজে গেলেন কেন? এটা কি তাঁদের সরকারি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে? মুখ্যমন্ত্রীকেই বা এত তড়িঘড়ি ছুটতে হল কেন? চিটফান্ড, চাকরি দুর্নীতি, বেআইনি কয়লা, গরু পাচার, বালি পাচার ইত্যাদিকে জড়িয়ে যে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ তাঁর দলের নেতাদের বিরুদ্ধে উঠেছে, তার কোনওটাকেই তো মিথ্যা বলা যাচ্ছে না। দলীয় ফাইলের সাথে এমন কোনও কেলেঙ্কারির ফাইলও সরানো হল কি না সে প্রশ্ন অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষত এই তদন্তে যখন কয়লা কেলেঙ্কারির বিষয়টি সরাসরি জড়িয়ে আছে এবং সেই অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর অতি ঘনিষ্ঠ লোকজনের নাম রয়েছে— সে ক্ষেত্রে একজন প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে তাঁর এই ভূমিকাও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকছে না।

একই সাথে প্রশ্ন থাকছে, ২০২০ থেকে কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত করছে সিবিআই। এতগুলো বছর পার করে তারা তদন্তের কতটুকু অগ্রগতি ঘটিয়েছে? এখন হঠাৎ মঞ্চে ইডির আগমন দেখা গেল! তারা এতদিন কী করছিল? বেআইনি লেনদেনের অভিযোগগুলি কি কেবলমাত্র ভোট এসে পড়লেই সিবিআই-ইডির মনে পড়ে? সেই কারণেই কি ২০২০ থেকে '২১-এর বিধানসভার নির্বাচন পর্যন্ত তদন্ত নিয়ে খানিকটা লাফালাফি করার পর ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনের সামান্য আগে কিছুটা নড়ে বসেছিল সিবিআই? ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন আসছে বলেই কি এখন আবার ইডি নেমেছে আসরে?

ইডি সিবিআই উভয় সংস্থাকে নিয়েই সারা ভারতে মানুষের ধারণা হল— কেন্দ্রীয় সরকারি দলে থাকলে কোনও দুর্নীতিবাজকে তারা দেখতে পায় না। আর বিরোধী দলের কোনও দুর্নীতির গন্ধ পেলে তারা তার প্রকৃত তদন্ত করে সত্য উদঘাটনের বদলে বিষয়টাকে ঝুলিয়ে রাখে পরের পর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় শাসক দলের হাতে বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রচারের রসদ জোগানোর জন্য। দুর্নীতির জন্য দায়ী নেতা-মন্ত্রী-প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও শাস্তি, সাধারণ মানুষের টাকায় গড়া সরকারি তহবিল উদ্ধার, প্রতারিত মানুষের টাকা ফেরতের ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনও কিছুর দায় যেন ইডি সিবিআই কারও নেই! এ ছাড়া কোনও বিরোধী দলের নেতা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হয়েই বিজেপিতে নাম লেখালে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর চোখে তিনি যেন অদৃশ্য হয়ে যান! পশ্চিমবঙ্গেও এমন উদাহরণ খুব কম নয়। কারা এর উদাহরণ তা রাজ্যের প্রায় প্রতিটি মানুষ জানেন। এখন সারা ভারত জুড়েই এই দুই এজেন্সির কাজ হয়েছে বিরোধী দলের দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা জোগাড় করা ও তাদের মামলার চোখ রাঙানি দিয়ে বিজেপির আশ্রয়ে পোরা! সাম্প্রতিক আইপ্যাক তদন্তের প্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী অক্লেশে যে কারণে এই রাজ্যের বিরোধী দলনেতার সাথেও দুর্নীতির সংযোগের কথা বলতে পেরেছেন। অবশ্য দুর্নীতির প্রশ্ন উঠলেই এই দলগুলোর নেতারা অন্যে কত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত তা বলতে থাকেন। যেন দুর্নীতির প্রতিযোগিতা চলছে দেশ জুড়ে!

পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক দলগুলিও এখন বাস্তবে এক একটা কর্পোরেট সংস্থা হয়ে উঠেছে। তাদের মাথায় থাকেন পুঁজিপতিদের পছন্দের নামকরা নেতা-মন্ত্রীরা। আর মাঝখানের স্তর থেকে একেবারে নিচের স্তর পর্যন্ত নেতা-কর্মীরা হয়ে উঠেছেন মজুরি শ্রমিক। কোনও রাজনৈতিক নীতি, আদর্শের বালাই থাকছে না, কোন দল বেশি টাকা দেবে, সুবিধা দেবে, সরকারি নেকনজরে রাখতে পারবে, পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবে, ইত্যাদির ভিত্তিতেই ঠিক হয় কোন দলের দিকে ভিড় বেশি থাকবে।

এই কারণেই রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনৈতিক কর্মীদের বদলে আইপ্যাকের মতো সংস্থার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে দলের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কর্মপন্থা ঠিক করার ক্ষেত্রে। নেতা কী বলবেন, কেমন করে বক্তৃতা দেবেন, কখন হাসবেন কিংবা কাঁদবেন, নাকি রাগবেন সব পেশাদার পরামর্শদাতারা ঠিক করে দিচ্ছেন। এটা এখন কর্পোরেট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সেই পেশাদাররা কখনও এই দল কখনও ওই দল— যার ঠিকা যখন নিচ্ছে তাদের ভোটে জেতানোর জন্য পরিকল্পনা করছে। তাই আইপ্যাক গুজরাটে, বিহারে বিজেপির পক্ষে কাজ করে পশ্চিমবঙ্গে তার বিরোধী তৃণমূলের ঠিকা নিয়েছে।

আর বিজেপি আরও বড় সংস্থাকে ধরেছে। কংগ্রেসও এমন কর্পোরেট সংস্থা ও পেশাদারদের নিয়োগ করে। রাজনীতির ময়দানে এই দলগুলো যে সব কথা বলে তার কোনওটি জনস্বার্থ থেকে, অন্তর থেকে বলা কথা নয়। কোন কথাটা বললে ভোটে সুবিধা হবে, পেশাদার পরামর্শদাতাদের দেওয়া প্রেসক্রিপশন অনুসারে জনসেবার ভেক ধরে তারা। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বুলি ও তার রাজনীতি আজ কতটা জনবিচ্ছিন্ন এ তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কারণেই বুর্জোয়া দলগুলোর টাকার থলির আয়তন বাড়ানোর প্রয়োজন উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। কালো টাকা, দুর্নীতির টাকা ছাড়া এত খরচ জোগানো মুশকিল। তাই বিজেপি যেমন দুর্নীতিগ্রস্তদের আশ্রয়কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও দলের মুখ বাঁচাতে কোনও রীতি নীতির তোয়াক্কা না করে মুখ্যমন্ত্রীকেই ফাইল কাড়তে আসরে নামতে হয়েছে।

ইতিহাস লেখার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপার এবং নমিত অরোরা তাঁদের সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্পিকিং অফ হিস্ট্রি, কনভারসেশন অ্যাবাউট ইন্ডিয়াজ পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এ ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক প্রবণতা এবং ইতিহাস বিকৃতির বিপদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একজন অভিজ্ঞ ও প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসবিদ হিসেবে রোমিলা থাপার সব সময়ই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উপাদান ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বর্তমানে ইতিহাস লিখন পদ্ধতি ও তার প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'সব সময়ই যে ইতিহাস অতীতকে আরও ভাল ভাবে অনুধাবনের জন্য লেখা তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই তা বর্তমানকে বৈধতা দেওয়ার জন্যও নতুন করে উপস্থাপন করা হয়।'

তাই যুক্তি নির্ভর ইতিহাস রচনা এবং ইতিহাসের যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে যখন হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া মন্তব্য থেকে ইতিহাস জানার প্রবণতা তৈরি হয় তখন তা সমাজ এবং জাতির বৌদ্ধিক জীবনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।' এই গ্রন্থে তিনি ইতিহাস চর্চার এই সাম্প্রতিক প্রবণতাকেই নমিত অরোরার সঙ্গে কথোপকথনের আকারে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এমন প্রবণতা তৈরির জন্য দায়ী কারণগুলিকেও তিনি চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর মতে, 'আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমাজবিজ্ঞানের যে কোনও শাখা সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজজীবনে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব ক্রমাগত বাড়ছে। এই হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস গড়েই উঠেছে পৌরাণিক কাহিনি এবং ভারতীয় ইতিহাস রচনার ঔপনেবিশক দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে। এদের কাছে ইতিহাস হল, এক ধরনের 'ফ্যান্টাসি' (কল্পনা), আর যারাই এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে তাদের 'মার্ক্সবাদী' হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া শুরু হয়।

ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি

একজন অলস এবং অমনোযোগী পাঠকের পক্ষেও এটা বোঝা কঠিন নয় যে, হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুকরণ। ঔপনিবেশিক যুগে এই প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা থেকে, যে— ভারতবাসীর ইতিহাস নেই, তাই ভারতবাসীকে সভ্য জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ভারতের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ব্রিটিশদেরই নিতে হবে। এই ধারণা থেকেই জেমস মিল ১৮১৭ সালে 'হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই বইতে তিনি ভারতের ইতিহাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন —'হিন্দু যুগ', 'মুসলিম যুগ' ও 'ব্রিটিশ যুগ'। এই ভাবে ধর্মের ভিত্তিতে ইতিহাসের যুগ বিভাজন যে কতটা অযৌক্তিক, বিশেষত ভারতের মতো একটি বহু জাতি-বহু ধর্ম অধ্যুষিত দেশের ক্ষেত্রে, তা বোঝা যায় যখন জৈন ধর্মাবলম্বী চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সম্রাট অশোকের রাজত্বকালকেও 'হিন্দু যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইতিহাসবিদ রোমিলা থাপারের মতে, ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় সমাজে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে জাতি হিসেবে উপস্থাপিত করার ধারণা তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেহেতু ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় ছিল মুসলমান শাসকেরা, তাই ভারতের ইতিহাসে মুসলমান শাসনের অধ্যায়কে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াস বা 'অন্ধকারময় যুগ' হিসেবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা ব্রিটিশ আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। তাই আজ হিন্দুত্ববাদীরা যতই 'নতুন করে' ইতিহাস রচনার দাবি তুলুন, তাঁদের ইতিহাস রচনার দৃষ্টিভঙ্গি আসলে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিরই অনুকরণ।

আর্য সমস্যা

ব্রিটিশ আমলে ধর্মের ভিত্তিতে যুগ বিভাজনকে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' পলিসির অংশ হিসেবে যে ভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, আজও ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইতিহাস বিকৃতির এই হীন প্রচেষ্টা আরও ফলপ্রসূ হচ্ছে কারণ বর্তমানে যুব সমাজের মধ্যে পাঠ্যবই থেকে ইতিহাস জানার পরিবর্তে 'হোয়াটসঅ্যাপ ইতিহাসে'র গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই হোয়াটসঅ্যাপ ইতিহাসে ভারতের আদিম ও প্রকৃত অধিবাসী হিসেবে আর্যদের উপস্থাপিত করা হচ্ছে এবং সমস্ত মুসলমান শাসককে 'বহিরাগত আক্রমণকারী' এবং 'রক্তপিপাসু স্বেচ্ছাচারী' হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। যেখানে ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন যে, অনার্য হরপ্পীয় সংস্কৃতি থেকেই ভারতীয় সভ্যতার সূচনা এবং অধিকাংশ পণ্ডিতই এ বিষয়ে সহমত যে, ভারতীয় আর্য হিসেবে যাদের চিহ্নিত করা হয় তাদের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ নয়, বরং ভারতীয় উপমহাদেশের সীমানার বাইরে অবস্থিত মধ্য এশিয়া থেকে তাঁরা এ দেশে এসেছিলেন। যে কারণে ভারতীয় আর্য ও ইরানীয় আর্যদের মধ্যে বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতীয়-বৈদিক আর্যরা যেমন 'সোম'

আটের পাতায় দেখুন

বিজেপির রাজনীতি দায়ী

একের পাতার পর

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নামক এক অদ্ভুত অসঙ্গতির কথা এবং সেই অসঙ্গতির অভিযোগ তুলে ডাকা শুরু হল ১ কোটি ৩৬ লক্ষ মানুষকে। ফলে এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে যেমন সমস্ত কাজ ফেলে দৌড়তে হচ্ছে শুনানিতে, তেমনই তাঁরা আশঙ্কিত যে তাঁদের দেওয়া তথ্যে কমিশন সন্তুষ্ট হবে কি না। এর বাইরেও বিরাট সংখ্যক মানুষ শুনানির ডাক পাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত। দেখা যাচ্ছে, কোনও কোনও বুথে একশো থেকে তিনশো জনকে পর্যন্ত অর্থাৎ গণহারে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে। তা হলে ম্যাপিং কথাটার তো কোনও মানেই থাকে না! অর্থাৎ যাঁদের ম্যাপড বলে এক বার কমিশনই ঘোষণা করেছে, তাঁদেরই আবার কমিশন আনম্যাপড বলে দাগিয়ে দিচ্ছে। ফলে শুনানিতে হাজির হওয়ার জন্য মানুষকে কাজ ফেলে, চাকরি এবং

পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদায় বিক্ষোভ। ১৮ জানুয়ারি

অন্যান্য নির্দিষ্ট কাজ বাদ দিয়ে দৌড়তে হচ্ছে। যাঁরা অন্য রাজ্যে কাজ করেন তাঁদের বহু টাকা খরচ করে ছুটে আসতে হচ্ছে। শুনানিতে ডাক পেয়ে বহু মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটছে, আবার অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছেন। এই সব মৃত্যুর দায় নির্বাচন কমিশন এড়াতে পারে? কেন কমিশন এর দায় নেবে না? কিন্তু হঠাৎ এই ডিসক্রিপেন্সির কথা নির্বাচন কমিশন তুলল কেন? নাগরিকদের পূরণ করা এনুমারেশন ফর্ম, যার বড় অংশ ছিল স্থানীয় ভাষা বাংলায়, বিএলও-রা তো মিলিয়ে স্ট্যাম্প দিয়ে স্বাক্ষর করে একটি কপি নাগরিককে ফেরত দিয়েছিলেন। তা হলে নতুন করে অসঙ্গতির প্রশ্ন তোলা হল কেন? বিএলওরা মূলত যান্ত্রিক বিভ্রাটের কথা জানাচ্ছেন।

বলছেন, তাঁরা এই পূরণ করা ফরম তাঁদের অ্যাপে আপলোড করার পর কমিশন আবার এআই-এর সাহায্য নিয়ে সেগুলিকে তাদের নিজস্ব অ্যাপে ইংরেজিতে ভাষান্তর করে আপলোড করেছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় পরিবর্তিত উচ্চারণকে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে ভাল ভাবে মেলানো প্রয়োজন ছিল। কমিশন সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। ফলে ২০২৫-এর তালিকায় থাকা নামের সঙ্গে মূলত বানানে অজস্র অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে। কমিশনের অ্যাপে সেগুলি মিসম্যাচ হিসাবে দেখাচ্ছে। কমিশন পাইকারি হারে তেমন সবাইকে নথি সহ দফতরে শুনানির জন্য তলব করছে। শুধু তাই নয়, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও আবার কমিশন নির্ধারিত ডকুমেন্ট নিয়ে তাঁদের হাজির হতে হবে।

শুনানিতে ডকুমেন্ট জমা দিয়েও একজন নাগরিক বুঝতে পারছেন না, তাঁর নাম সত্যিই তালিকায় থাকল কি না। কারণ বিএলও, এইআরও, ইআরও নয়, এই তথ্য পরীক্ষিত হবে ডিএম বা ডিইও-র দ্বারা। আবার নাগরিকরা যে তথ্য দিচ্ছেন, তার কোনও প্রাপ্তিও স্বীকার করা হচ্ছে না। অর্থাৎ কমিশন তার নিজের ভুল সংশোধনের দায় নাগরিকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ এই ডিসক্রিপেন্সিগুলি বিএলওরা, যাঁরা এলাকার মানুষকে চেনেন বা এই সমস্যাগুলির ধরন বোঝেন, তাঁরাই মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। বাস্তবে যত দিন গেছে ততই কমিশন বিএলওদের উপর নির্ভর না করে ডকুমেন্টের উপর জোর দিয়েছে, যে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা বহু নাগরিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ সহজ প্রমাণগুলিকে কমিশন গ্রাহ্য করছে না। ফলে নাগরিকদের হেনস্থা বেড়েই চলেছে।

বিবাহিত মহিলাদের পদবি পরিবর্তনকেও অসঙ্গতি বলে দেগে দিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষেই তা করা হচ্ছে। যে মহিলাদের বাবা ও মা মারা গেছেন, তাঁরা শুনানিতে গিয়ে কোন নথিতে বাবা বা মা-র সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণ করবেন, বিশেষত যাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, তা নিয়ে তৈরি জটিলতায় তাঁরা হেনস্থা হচ্ছেন। এমনকি ভাই-বোনের সংখ্যা বেশি হলেও বা কমিশনের ভুলে বেশি দেখালেও তার জবাবদিহি নাগরিককেই করতে হচ্ছে। আদিবাসী, বনবাসী মানুষরাও যারপরনাই হেনস্থা হচ্ছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে নাগরিকদের হেনস্থা করাই যেন কমিশনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমিশনের দোষে ভুল বয়স এলে তা ঠিক করার জন্য মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, যেটি এত দিন পর্যন্ত বয়সের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সরকারি সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়েছে, তা বাতিল করেছে কমিশন। বলেছে, অ্যাডমিট কার্ড নয়, কোনও সরকার স্বীকৃত বোর্ড থেকে পাশের সার্টিফিকেট দরকার। অদ্ভুত ব্যাপার! যে রাষ্ট্র দেশের বিরাট এক অংশের জনগণকে শিক্ষার সুযোগই দেয়নি, সেই রাষ্ট্রই আবার সেই নাগরিককে পাশ করার সার্টিফিকেট না থাকার জন্য দায়ী করছে। এই নাগরিক-ভোগান্তির সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে নির্বাচন কমিশন তার ভুলের দায় নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

কমিশনের খামখেয়ালিপনার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে সাধারণ মানুষ যখন ক্ষোভে ফেটে পড়ছে তখন বিজেপি নেতারা বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই খামখেয়ালিপনাকে সমর্থন করে চলেছেন। তাঁরা নাকি কোথাও জনগণের হেনস্থা দেখতে পাচ্ছেন না। আসলে তাঁরা নিজেদের চোখ দিয়ে দেখলে এগুলির সবই তাঁদের চোখে পড়ত। তাঁরা দেখছেন হয় দলের দিল্লি নেতাদের চোখ দিয়ে, না হয় নির্বাচন কমিশনের চোখ দিয়ে। বাস্তবে এঁদের রাজ্যের জনগণের প্রতি কোনও দরদ বা দায়িত্ববোধ কিছুই নেই। এঁরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেন না, দেখেন শুধুই ভোটার হিসেবে এবং শুধুমাত্র তাঁদের দলের ভোটার কি না সেই বিচার করে। বাস্তবে ভোটার তালিকায় দেশের নাগরিকদের নাম তোলাই যদি কমিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তবে নাগরিকদের সঙ্গে কমিশনের ব্যবহার অন্য রকম হত। তা হত নাগরিক সহায়ক। কীসে তাদের ভোগান্তি কম হয় বা একেবারেই ভোগান্তির মুখোমুখি না হতে হয় কমিশন সেই চেষ্টা করত। বাস্তবে নাগরিকদের সঙ্গে কমিশনের আচরণ সম্পূর্ণ বিদ্বেষমূলক। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে রজ্য বিজেপির নানা স্তরের নেতারাও অহরহ বলে চলেছেন যে, এ রাজ্য অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে। কমিশনের আচরণ থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনেরও উদ্দেশ্য এস আই আর এর মধ্য দিয়ে বিরাট একটা অংশের মানুষের নাম বাতিল করে সেই প্রচারটাকেই সত্য বলে প্রমাণ করা। তাই কোনও রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এবং অত্যন্ত কম সময় নিয়েই কমিশন এসআইআরে নেমে পড়েছে। বিএলও-রা জানাচ্ছেন, তাঁদের কাজের জন্য কমিশন থেকে কোনও গাইডলাইন বা কোনও ম্যানুয়াল বুক দেওয়া হয়নি। যে অ্যাপ তাঁদের ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে তা ব্যবহার করার জন্য তাঁদের কোনও রকম প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়নি। ফলে বহু বিএলও গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এমনকি তাঁদের ঊর্ধ্বতন এইআরও বা ইআরওদের কাছেও কমিশনের কোনও নির্দিষ্ট গাইডলাইন বা সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই। ফলে বিএলওরা নিচের তলায় যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য সমাধানের কথা এইআরও-ইআরওরা-ও বলতে পারছেন না। তাঁরা শুধু উপরওয়ালা দেখিয়ে তাঁদের দায়িত্ব শেষ করছেন।

কমিশনের যাঁরা এস আই আরের নিত্যনতুন নীতি নির্ধারণ করছেন তাঁরা তো কেউ মূর্খ নন। দেশ সম্পর্কে, দেশের মানুষ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা থাকারই কথা। নাকি কমিশনার এবং তাঁদের অধীন অফিসাররা সমাজের এতই উচ্চকোটির বাসিন্দা যে দেশের মানুষের বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁদের সঠিক কোনও ধারণাই নেই। আর না হয়, তাঁরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে, বা কোনও অদৃশ্য নির্দেশ কার্যকর করতে নাগরিকদের এ ভাবে হেনস্থা করছেন। তাঁদের আচরণ থেকে দেশের মানুষ যদি মনে করেন কেন্দ্রের বিজেপি নেতাদের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই তাঁদের একমাত্র যোগ্যতা তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যাবে কি? আর যদি তাঁরা মনে করে থাকেন, যে হেতু তাঁদের সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হতে হয় না এবং তাঁরা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত এবং তাঁরা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের পছন্দের লোক, তাই

পূর্ব মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী বিডিও অফিসে বিক্ষোভ। ১৩ জানুয়ারি

তাঁরা মানুষকে নিয়ে, মানুষের জীবন নিয়ে যা খুশি করতে পারেন, তাঁদের কেউ কিছু করতে পারবে না তবে দেশের মানুষকেই তাঁদের এই উদ্ধত আচরণের জবাব দিতে হবে।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র সাধারণ মানুষ কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছেন। কোথাও বিএলওকে ঘেরাও করছে তারা, কোথাও বিডিও অফিস, কমিশন অফিসে বিক্ষোভ হচ্ছে। রাস্তা অবরোধ হচ্ছে। বিজেপি নেতারাও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়ছেন। কমিশন দ্রুত নিজেদের আচরণ সংশোধন না করলে এমন বিক্ষোভ আগামি দিনে বাড়তেই থাকবে।

শুনানিতে হয়রানির তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

এসআইআর নিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে ক্রমাগত হয়রানি করার তীব্র প্রতিবাদ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৫ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

গত ২৭ নভেম্বর ও ১৬ ডিসেম্বর ‘এসআইআর’ প্রসঙ্গে সিইও দফতরে দলের তরফ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে আমরা যে আশঙ্কাগুলির কথা বলেছিলাম তা ক্রমাগত সত্যে পরিণত হচ্ছে। জীবিত ব্যক্তিকে মৃত হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া, ‘নন ম্যাপিং’-এর সমস্যা, বাবা-মায়ের একাধিক সন্তানজনিত অদ্ভুত সমস্যা, বাবা-মায়ের বয়সের সঙ্গে সন্তানের বয়সের ফারাকজনিত সমস্যা, বৃদ্ধ-অসুস্থদের বহু দূর থেকে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনানির জন্য অপেক্ষা, যাচাই-পুনর্যাচাই, বারবার নিয়ম পরিবর্তন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এআই সৃষ্ট লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্যগত অসঙ্গতি। অমর্ত্য সেনের মতো মানুষরা ভারতের নাগরিক কি না তা ঠিক করতে যদি এআই লাগে তা হলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে নির্বাচন কমিশন রাখার কী দরকার?

জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকার ট্যাক্সের তহবিল খরচ করে ট্যাক্স-দাতা সেই জনগণকেই এত সরকারি হেনস্থার শিকার হতে হবে কেন? আর কত মৃত্যুমিছিল আমাদের দেখতে হবে— কমিশনকে এই প্রশ্ন করতে চাই। আমরা অবিলম্বে কমিশনকে মানবিক দৃষ্টিরহিত না হয়ে, তাড়াহুড়ো না করে, আরও সময় নিয়ে ত্রুটিহীন তালিকা তৈরি করার দাবি জানাচ্ছি।

পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরোধিতায় হিরোশিমা ও নাগাসাকির বাসিন্দারা

গণদাবীর ৯-১৫ জানুয়ারি সংখ্যায় দেখানো হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের নীতির ফলে নানা দিক থেকে জনজীবন বিপদগ্রস্ত হবে। তেজস্ক্রিয় দূষণ এবং পারমাণবিক দুর্ঘটনার আশঙ্কাই শুধু নয়, এর থেকে তৈরি হওয়া ইউরেনিয়াম আইসোটোপ ব্যবহার করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি হবে এবং তার ফলে সারা বিশ্বে যুদ্ধ উত্তেজনা ও আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের মতো জাপানের কেন্দ্রীয় সরকারও সম্প্রতি পারমাণবিক শক্তি প্রসারের উদ্যোগ নেওয়ায় সে দেশের বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিরাই প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

পারমাণবিক বোমায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুই শহরেরই সিটি অ্যাসেম্বলির সদস্যরা বর্তমান শাসকদলের পারমাণবিক শক্তি প্রসারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে সম্মিলিতভাবে বিবৃতি জারি করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমার ভয়ঙ্কর অভিঘাতে ভুক্তভোগী জাপান ১৯৭১ সালে তাদের পার্লামেন্টে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে 'নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী তিন নীতি' গ্রহণ করে। এর দ্বারা তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে প্রথমত, জাপান নিজে কোনও পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না।

দ্বিতীয়ত, কোনও ভাবে অন্য দেশ থেকেও পারমাণবিক অস্ত্র সংগ্রহ করবে না এবং তৃতীয়ত জাপানের ভূখণ্ডের মধ্যে অন্য কোনও দেশকে কোনও পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করতেও তারা অনুমতি দেবে না। এতদিন পর্যন্ত জাপানের সব সরকারই এই নীতি মেনে এসেছে। কিন্তু বর্তমান শাসক দল ঘোষণা করেছে যে, তারা এবার ওই নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করবে।

সরকারের এই ঘোষণার ফলেই উদ্বেগ প্রকাশ করে সিটি অ্যাসেম্বলিগুলো তাদের বিবৃতিতে বলেছে যে, দীর্ঘদিন অনুসৃত ওই তিন নীতি থেকে সরে আসা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এর ফলে জাপানের জনজীবন হয়তো আবারও পারমাণবিক ধ্বংসলীলার শিকার হতে পারে। স্পষ্টতই, বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য সব পুঁজিবাদী দেশের মতোই জাপানকেও অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথে যেতে হচ্ছে এবং সে দেশেও পুঁজিবাদের সংকটজনিত বিভিন্ন সমস্যা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখতে কোনও একটা যুদ্ধ উত্তেজনা জাপানি পুঁজিপতিদেরও অচিরেই সৃষ্টি করতে হবে। নিউক্লিয়ার শক্তি বিরোধী নীতি পুনর্বিবেচনা তারই পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র। কিন্তু পারমাণবিক শক্তির বিধ্বংসী ক্ষমতা যে কত ভয়ঙ্কর এবং সুদূরপ্রসারী তা জাপানের হতভাগ্য জনগণ একদিন জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এমনকি আজও তার মাশুল তাঁরা দিয়ে চলেছেন।

তাই স্বাভাবিকভাবেই একেবারে নিচের তলার জনসাধারণের সংগঠন থেকে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্ব জুড়ে শান্তিকামী মেহনতি জনসাধারণকেও পারমাণবিক শক্তি বর্জন ও যুদ্ধচক্রান্ত বন্ধের দাবিতে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

সূত্রঃ দি স্টেটসম্যান ১১.০১.২০২৬

মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণ ত্রিপুরায়

আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহিদ মাস্টারদা সূর্য সেন স্মরণ দিবস উদযাপন করলেন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর নেতৃত্বে ছাত্র-যুব-মহিলারা। ১২ জানুয়ারি

গ্রিনল্যান্ডের দৃপ্ত ঘোষণা
'গ্রিনল্যান্ড ইজ নট ফর সেল'

'গ্রিনল্যান্ড গ্রিনল্যান্ডবাসীদের'। সাম্প্রতিক সময়ে রাজধানী নুক শহর ও তার বাইরে বারবার শোনা যাচ্ছে এই ঘোষণা। এ ধ্বনি গ্রিনল্যান্ডবাসীদের জাতীয়তাবোধের, একই সাথে এ ধ্বনি উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতারও। ভেনেজুয়েলা আক্রমণের আবহের মধ্যেই গ্রিনল্যান্ড দখলের লাগাতার হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক গ্রিনল্যান্ডবাসীকে মাথাপিছু ১ লক্ষ ডলার দেওয়া হবে। তারা বলছে, রাশিয়া বা চিন যাতে গ্রিনল্যান্ড দখল করতে না পারে সে জন্যই আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা চায়। বলছে, আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার স্বার্থেই নাকি গ্রিনল্যান্ড কেনার পরিকল্পনা। প্রস্তাবে রাজি না হলে সেনা নামানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছে আমেরিকার প্রশাসন। কিন্তু গ্রিনল্যান্ড দখলের প্রতি আমেরিকার এত আগ্রহ কেন?

প্রায় তিন শতাব্দী ধরে গ্রিনল্যান্ড ছিল ডেনমার্কের উপনিবেশ। ১৯৭৯-তে স্বায়ত্তশাসন ও ২০০৯-এ বিস্তৃত স্বশাসন চালু হলেও গ্রিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতি কিন্তু এখনও ডেনমার্কেরই হাতে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গ্রিনল্যান্ডকে হস্তগত করার প্রচেষ্টা আজকের নয়। বিগত ১০০ বছর ধরে তারা এই চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৮৬৭ সালে আলাস্কা কেনার পর মার্কিন স্বরাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম সিওয়ার্ড গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ডেনমার্কের কাছ থেকে গ্রিনল্যান্ড কিনে নেওয়ার প্রস্তাব রেখেছিল তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকা গ্রিনল্যান্ডের ওপর সামরিক ঘাঁটি তৈরি করেছিল যা আজও রয়েছে। আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির কাছে গ্রিনল্যান্ড একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল। উত্তর আমেরিকা থেকে রাশিয়ার অভিমুখে মিসাইল উৎক্ষেপণের সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছনোর পথ গেছে এই উত্তর মেরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে। তাই মার্কিন সামরিক পরিকল্পনায় গ্রিনল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্বের অন্য দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাশিয়া ও চিন উত্তর মেরু অঞ্চলে ঘাঁটি বিস্তার শুরু করেছে। কাজেই যেমন করে হোক এখন আমেরিকার গ্রিনল্যান্ডের উপর দখলদারি চাই। পুরো উত্তর মেরু অঞ্চলে যে কোনও যুদ্ধের রসদ সরবরাহ থেকে এয়ারস্পেস, রাডার, সমুদ্রপথ, নৌ-পরিবহণ ইত্যাদি সবকিছুর ওপরই নিয়ন্ত্রণ রাখার এ এক সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। এর মধ্যে গ্রিনল্যান্ডবাসীর অবস্থাটা কেমন? সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা কিংবা ঔপনিবেশিক ডেনমার্ক কেউই কি গ্রিনল্যান্ডবাসীর প্রতিদিনের সমস্যা, সংকট, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত? আদৌ তা নয়।

গ্রিনল্যান্ড সাতান্ন হাজার জনসংখ্যার একটি স্বশাসিত দেশ। কিন্তু একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের মর্যাদা তার নেই। বরং এই ভূখণ্ডটি ব্যবহৃত হচ্ছে অন্য দেশের সাম্রাজ্য বিস্তারের কৌশলগত সুবিধা অর্জনের উদ্দেশ্যে। গ্রিনল্যান্ডবাসীদের বাসস্থানের সমস্যা, জোর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে তথাকথিত উন্নয়নের ফলে উদ্ভূত নানা ধরনের সমস্যা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এ সব সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। উপেক্ষিত মেরু অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের নিরাপত্তা। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অতি মুনাফার লালসায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে। বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে। ফলে মেরুর তুষার স্তূপ ক্রমশ গলছে। জাহাজের জন্য নতুন সমুদ্র পথ খুলে যাচ্ছে। বরফের নিচে চাপা পড়ে থাকা বিপুল পরিমাণ ও বিরল ধরনের খনিজ সম্পদগুলি ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠছে, যার দিকে শকুনের মতো তাকিয়ে আছে আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তিধর দেশগুলি। তাই 'জাতীয় নিরাপত্তা' বা 'অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা' ইত্যাদি যে কথাই আমেরিকা মুখে বলুক না কেন, মেরু এলাকার সম্পদ ভাণ্ডার লুঠ করাটাই তার গ্রিনল্যান্ড দখলের মূল উদ্দেশ্য। সমগ্র দক্ষিণ মেরু অঞ্চলকে তীব্র শোষণের অভিঘাতে ছিবড়ে করে সাম্রাজ্যবাদ আজ উত্তর মেরু অঞ্চলের দিকে থাবা বাড়াচ্ছে। আমেরিকার গ্রিনল্যান্ড দখল বা রাশিয়া ও চিনের উত্তর মেরু অঞ্চলে ঘাঁটি বিস্তার, এ সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য এক।

বহু শতাব্দী ধরে পদদলিত গ্রিনল্যান্ডের বুকে এবার দাবি উঠছে স্বাধীনতার। গ্রিনল্যান্ডের পাঁচ প্রধান পার্টি একযোগে বলেছে 'আমরা আমেরিকান কিংবা ড্যানিশ নই, আমরা গ্রিনল্যান্ডার', বলেছে 'গ্রিনল্যান্ড ইজ নট ফর সেল'— গ্রিনল্যান্ড কেনাবেচার জিনিস নয়। এই ঘোষণাই অন্ধকারে আশার আলো। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সর্বাত্মক সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একমাত্র গ্রিনল্যান্ডের নিজস্ব স্বাধীন ও সার্বভৌম সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটা সম্ভব।

এআইইউটিইউসি-র চিঠি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে

১৩ জানুয়ারি কলকাতায় ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের সভায় এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর উদ্দেশে নিম্নলিখিত চিঠি দেন।

ন্যূনতম ইপিএফও পেনশন বর্তমানে প্রতি মাসে দেওয়া হয় মাত্র ১০০০ টাকা। এই টাকায় পরিবার চলা দূরের কথা, এক জন ব্যক্তির এক বেলা খাবার জোগাড় করাও সম্ভব নয়। আমাদের দাবি, মাসিক পেনশন ন্যূনতম ৯০০০ টাকা করতে হবে। আপনি জানেন যে, 'অটল পেনশন যোজনা'য় ন্যূনতম পেনশন হল ৩০০০ টাকা। আপনি এটাও জানেন যে, এই প্রকল্প পুরোপুরি প্রত্যেক শ্রমিকের অনুদান ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় চলে। এই পেনশন প্রকল্পে মালিকদের অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। আপনাকে আরও জানাতে চাই যে, পুরনো পেনশন স্কিম (ওপিএস) অনুযায়ী বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী পরিবারের পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা মাসিক ন্যূনতম ৯০০০ টাকা। সরকারের ওপিএস নিয়ম মেনেই এখনও সরকারি কর্মীদের জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড (জিপিএফ) শুধুমাত্র কর্মীদের অনুদান থেকেই সংগৃহীত। ওপিএস নিয়ম মেনেই এই পেনশন একই সঙ্গে মহার্ঘ ভাতা (ডি এ) বা মহার্ঘ অনুদান (ডি আর)-এর সাথে যুক্ত। যেটা নিয়ম অনুযায়ী বছরে ২ বার বাড়বে এবং কার্যকর হবে জানুয়ারি ও জুলাই মাসের ১ তারিখ থেকে। সারা ভারত উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী ইপিএফও-র অধীন সমস্ত কর্মীর পেনশন অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত। বর্তমানে দেয় ন্যূনতম পেনশন অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত। ইপিএফও-র এর ক্ষেত্রে কোনও বেতন সীমা বেঁধে দেওয়ার নিয়ম বাতিল করতে হবে এবং বর্তমানে ১৫ হাজার টাকার বেতন সীমা তুলে দিতে হবে। সাধারণত কর্মীদের জরুরি প্রয়োজনে পিএফ-এর টাকা তোলার সময় বা পুরোপুরি টাকা তোলার সময় বহু বাধা নিষেধের মোকাবিলা করতে হয়। বেশিরভাগ কর্মী এইসব ব্যাপারে, বিশেষ করে অনলাইন প্রথায় সড়গড় নন। তাই টাকা তোলার জন্য তাঁদের হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সমস্ত রকম জটিলতা দূর করার ব্যবস্থা করা এখনই দরকার। সাধারণ ভাবে পিএফ-এর টাকা তোলার প্রক্রিয়া সহজ করা এবং দুর্নীতিমুক্ত করা দরকার।

আশা করি উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

পাঠকের মতামত

আপনি কোন পক্ষে

মানুষের সৃষ্টি কিংবা সমাজ গঠনের পেছনে কোনও অলৌকিক ঘটনা কাজ করে না। ইতিহাস আমাদের শেখায় সমাজ কখনও হঠাৎ করে তৈরি হয় না। এর পেছনে থাকে বহু মানুষের দীর্ঘদিনের শ্রম, চিন্তা, ত্যাগ ও লড়াই। সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, কবি, দার্শনিক, লেখক, বিপ্লবী প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সময়কে নির্মাণ করেন। সভ্যতার প্রতিটি স্তম্ভ গড়ে ওঠে মানুষের সম্মিলিত অবদানে।

আজ আমি যে সময়ে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো লিখছি, সেই সময়টি নিঃসন্দেহে এক সংকটময় সময়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ তার চরম পচনশীল পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এই পচন শুধু অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ নয় এটা রাজনীতি, প্রশাসন, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধ সবকিছুকে গ্রাস করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে হোক বা সমগ্র ভারতবর্ষে আজ রাজনীতি এক ভয়ঙ্কর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবিকা প্রায় ধ্বংসের মুখে। চাকরি নেই, কাজ নেই, পরীক্ষার নিশ্চয়তা নেই। বছরের পর বছর পড়াশোনা করেও তরুণেরা আজ দিশেহারা। অথচ রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরা জনগণের স্বার্থ রক্ষার বদলে দুর্নীতির সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন।

একটার পর একটা দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিয়োগ কোনও ক্ষেত্রই আর কলুষমুক্ত নেই। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলেই তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে জেল, মিথ্যা মামলা, পুলিশি হয়রানি, কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত।

তবুও মানুষ চুপ করে থাকেনি।

আজ থেকে দেড় বছর আগে আর জি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সেই ভয়াবহ ঘটনা শুধু একটি রাজ্যের বিষয় ছিল না। তা সারা ভারতবর্ষের বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। সেই আন্দোলন কখনও সীমিত হয়েছে, কখনও বিশাল আকার ধারণ করেছে। সরকারের উপর চাপ তৈরি হয়েছিল, কিছু দাবি মানতেও তারা বাধ্য হয়েছিল।

এই আন্দোলনের ভেতর থেকেই উঠে এসেছিল কিছু মুখ যাঁরা শুধু স্লোগান দেননি, বরং দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলনকে সঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মধ্যেই একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের নেতা, ডাক্তার অনিকেত মাহাতো।

আন্দোলনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর ভূমিকা ছিল স্পষ্ট, যুক্তিনির্ভর এবং দায়িত্বশীল। তিনি বুঝেছিলেন, আবেগ যেমন জরুরি, তেমনি আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও সঠিক দিকনির্দেশ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন আন্দোলনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে রেখে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ নিজের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে, জেনেও যে ভবিষ্যতে আর কখনো সরকারি চাকরি পাওয়ার সুযোগ থাকবে না। তিনি জানেন এর অর্থ কী। আর্থিক অনিশ্চয়তা, সামাজিক চাপ। তবুও তিনি পিছিয়ে যাননি।

নিজের নিরাপত্তা, নিজের কেরিয়ার, নিজের স্বপ্ন সবকিছুকে পাশে সরিয়ে রেখে তিনি সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। এই মানসিকতা কোনও সাধারণ বিষয় নয়। এই সাহস, এই আত্মত্যাগ এটাই ইতিহাস তৈরি করে। এটাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটাই প্রমাণ করে, সবকিছু বিক্রি হয়ে যায়নি, সব মানুষ নতজানু হয়নি।

আমরা আজ খবরের কাগজে অনেক কিছু পড়ছি, সামাজিক মাধ্যমে অনেক আলোচনা দেখছি। কেউ পাশে দাঁড়াচ্ছেন, কেউ সমর্থনের কথা বলছেন। কিন্তু শুধু সহানুভূতি বা ফেসবুক পোস্ট যথেষ্ট নয়।

আজ প্রয়োজন বাস্তব অবস্থান নেওয়ার। আজ প্রয়োজন ডাক্তার অনিকেত মাহাতোর পাশে দাঁড়ানো। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের নয়, তাঁর ন্যায্য দাবির পাশে দাঁড়ানো। তিনি যা চাইছেন, সেই চাওয়াকে সম্মান করা। কারণ এই লড়াই কোনও একজন মানুষের নয়। এটা আমাদের সবার।

ইতিহাস কখনও নিরপেক্ষ থাকে না।

ইতিহাস প্রশ্ন করে—এই সময়ে দাঁড়িয়ে আপনি কোন পাশে ছিলেন?

দীপক মাজি
বাঁকুড়া

জম্মুতে মেডিকেল কলেজ বন্ধ বিদ্বেষের রাজনীতির সর্বনাশা পরিণাম

জীবনে প্রথম মেডিকেল কলেজে ভর্তি, হস্টেলে একত্রে থাকা, প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের, পাড়া-প্রতিবেশীর চিকিৎসায় সাহায্য, বাবা-মায়ের মুখে হাসি ফোটানো—আসিফের স্বপ্ন অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়ল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির বাধায়। শুধু তারই নয়, ভেঙে গেল বেশ কয়েকজন মুসলিম, এমনকি ধর্ম পরিচয়ে হিন্দু ছাত্রছাত্রীর স্বপ্নও। অনুমোদনের মাত্র চার মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে আচমকা জম্মুর কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মেডিকেল কলেজ বন্ধ করে দিল এনএমসির বকলমে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। রাজ্য তথা দেশের ইতিহাসে একটা ন্যক্কারজনক ও বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল এই ঘটনা।

অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা, দুর্গম এলাকার মানুষের কাছে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং চিকিৎসকরা কতটা অপরিহার্য, তা সকলেই বোঝেন। অথচ কাটরায় শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল কলেজ বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে সরকার জনস্বাস্থ্যের কথা এতটুকু ভাবল না। এনএমসি বলেছে, কলেজে শিক্ষকের অভাব রয়েছে, নেই লাইব্রেরি ও উপযুক্ত ক্লাসঘর। কলেজের অনুমোদন দেওয়ার সময় সরকার কি এ সব জানত না? সেই সব অভাব পূরণ না করে তারা কলেজের অনুমোদন দিয়েছিল কিসের ভিত্তিতে! ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এ সব কথা আসলে নিতান্ত অজুহাত।

আসলে কলেজ বন্ধের পিছনে রয়েছে উগ্র মুসলিম-বিদ্বেষ। বিজেপি প্রভাবিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ওই কলেজকে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের তকমা দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। তারা জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে স্মারকলিপি দেয়। কারণ তাদের দাবি, বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের অনুদানে এই কলেজ গড়ে উঠেছে। ফলে ওই কলেজে মুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বী ছাত্ররা পড়াশোনা করতে পারবে না। প্রশ্ন আসবেই, ভর্তি নেওয়া হবে কীসের ভিত্তিতে, ধর্ম না মেধা? আর সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন তো এটা জানতই যে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। ফলে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতেই প্রথম বর্ষে ৫০টি সিটে ৪২ জন মুসলিম-ছাত্র ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল। সমস্ত কিছু হয়েছিল আইন মেনেই। তা সত্ত্বেও বিনা নোটিশে কলেজটি বন্ধ করে দেওয়া হল সম্পূর্ণ বে-আইনি ভাবে।

কলেজের এডুকেশন ডিরেক্টর কলেজ বন্ধের ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষকরা কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মর্মাহত হয়েছেন। তাঁদের মতামতকেও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা বলেছেন, মেডিকেল কলেজ নিয়ে এত রাজনীতি হলে সেই কলেজের প্রয়োজন নেই, ছাত্রদের অন্য কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হবে। বিস্মিত হতে হয় যে, এ ছাড়া বিরোধিতা করার আর কোনও জোরালো কথা তিনি খুঁজে পেলেন না! তিনি একবারও বললেন না যে, কলেজ বন্ধ করা যাবে না।

কলেজের এক ছাত্র বলেছে, কলেজ ক্যাম্পাসে আমরা সকলে একত্রে ক্লাস করতাম, কোনও অসুবিধা হত না। বাইরের কিছু মানুষের বিক্ষোভে আমাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে গেল। স্বাধীনতার সময় থেকে অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আটের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবি

একের পাতার পর

বিশ্বাস এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই মিটিংয়ে দেশের বিদ্যুৎ ব্যবসায়ী একচেটিয়া শিল্পপতিদের প্রতিনিধিরা, বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির প্রতিনিধিরা, কয়েকটি এনজিও-র প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের (গৃহস্থ, ক্ষুদ্র বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প এবং ক্ষুদ্র কৃষি) জন্য এই বিলের সামগ্রিক প্রতিবাদ করে একমাত্র গ্রাহক সংগঠনের প্রতিনিধিরাই বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, বিদ্যুৎ একটি অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা। এটাকে কখনোই মুনাফার পণ্য হিসেবে দেখা উচিত নয়। এই সংশোধনী বিলে তথাকথিত ক্রস সাবসিডি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পুরোপুরি বিলুপ্ত করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটা সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহক এবং কৃষকদের খুবই সংকটে ফেলবে। এই বিলে 'ইউনিভার্সাল সার্ভিস অবিলিগেশন' প্রথাকে পুরোপুরি তুলে দিয়ে একটি এলাকায় একাধিক বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিকে ব্যবসা করার লাইসেন্স দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিশাল বিস্তৃত সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে বেসরকারি মালিকদের মুনাফা লোটার এই ব্যবস্থা সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থকে বিঘ্নিত করবে।

বেসরকারি মালিকরা একমাত্র বেশি মুনাফা ভিত্তিক এলাকায় বিদ্যুৎ বন্টনের ব্যবসা করবে, যার ফলে রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি প্রবল আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তা ছাড়া একটি এলাকায় একাধিক বেসরকারি কোম্পানিকে বন্টনের ব্যবসা করতে বাস্তবে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসাতেই হবে। যা কিনা গ্রাহকদের টাকা লুট করার একটা সুন্দর ব্যবস্থা ছাড়া কিছু নয়। বন্টন কোম্পানিগুলো প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের আবেদন না জানাতে পারলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকেই (সুয়োমোটো) ট্যারিফ নির্ধারণ করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, সেটা গ্রাহকদের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করবে। গ্রাহক সমিতি সেটা বাতিল করার আবেদন জানিয়েছে।

অ্যাবেকা দাবি জানিয়েছে, কমিশন গ্রাহক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া যাতে ট্যারিফ নির্ধারণ না করে। এই সংশোধনী বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে, খরচ অনুযায়ী ট্যারিফ নির্ধারণ করার (কস্ট রিফ্লেকটিভ ট্যারিফ)। এই প্রস্তাব সাধারণ গ্রাহক এবং কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের স্বার্থবিরোধী, কারণ এই গ্রাহকরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না। রাজ্য সরকারি বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানিগুলো প্রচুর টাকা ক্ষতিতে চলছে, এই মিথ্যা প্রচার করে বন্টন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করার চেষ্টা চলছে। লোকসান নয়, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এ বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানি, পরিবহণ কোম্পানি, এবং বন্টন কোম্পানিগুলোকে ন্যূনতম ১৬ শতাংশ লাভ যুক্ত করে ট্যারিফ নির্ধারণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। বেসরকারিকরণের ভয়াবহ পরিণাম দেখা যাচ্ছে ওড়িশায়। এই রাজ্যে বেসরকারিকরণের পর চূড়ান্ত গ্রাহক পরিষেবার গাফিলতির কারণে ওই রাজ্য সরকার একের পর এক বেসরকারি কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে।

সংবিধানে বলা আছে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং রাজ্যের যৌথ বিষয়। এই সংশোধনী বিলে রাজ্যকে উপেক্ষা করে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ কেন্দ্রিকরণ করার যে প্রচেষ্টা রাখা হয়েছে গ্রাহক সমিতি তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। গ্রাহক সমিতি দাবি জানিয়েছে বিদ্যুৎ বিষয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সবচাইতে বড় স্টেকহোল্ডার বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এই সংশোধনী বিল বিদ্যুৎ বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে তাদের মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই কমিটির মতামত জনসাধারণকে অবিলম্বে জানাতে হবে।

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য বঞ্চনার কতটা সুরাহা করতে পারছে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ২০১৬ সালে প্রধানত দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের চিকিৎসার কথা বলে স্বাস্থ্য সাথী নামক একটি বিমা প্রকল্প চালু করে। এটি একটি সরকারি বিমা প্রকল্প। পরবর্তীকালে অস্থায়ী কর্মী, আধা সরকারি সংস্থার কর্মী সহ মধ্যবিত্ত মানুষের জন্যেও এর সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়। রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ২ কোটি ৪৫ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ ৮ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় রয়েছেন। অর্থাৎ রাজ্যের সিংহভাগ মানুষই স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের সুযোগ পাচ্ছেন। এই কার্ডের মাধ্যমে একটি পরিবারের বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার কথা। প্রাথমিক ভাবে এই কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতাল থেকে মানুষ এই কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা পেতেন। বর্তমানে সরকারি হাসপাতালগুলিতেও স্বাস্থ্য সাথী কার্ডকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অর্থাৎ আজ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ছাড়া কোথাও চিকিৎসার সুযোগ খোলা নেই। কেবলমাত্র বেসরকারি হাসপাতালে যেখানে চিকিৎসা পেতে মোটা অঙ্কের টাকা গুনতে হয় সেখানেই একমাত্র কার্ড ছাড়া চিকিৎসা পাওয়া যেতে পারে, যার সুযোগ রাজ্যের মুষ্টিমেয় মানুষই গ্রহণ করতে সক্ষম।

পাশাপাশি আমরা লক্ষ করছি, ২০১৮ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ্মান ভারত নামক একই রকম একটি বিমা প্রকল্প চালু করেছে। সারা ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে অত্যাধুনিক অর্থাৎ ডিজিটালাইজড করার নাম করে চালু করা হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল হেলথ মিশন। আয়ুষ্মান ভারত কার্ডটি এই মিশন পরিচালনার অন্যতম হাতিয়ার। এই কার্ড চালু করাকে কেন্দ্র করে নানা সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ এবং বিরোধ থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই কার্ডটি পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু রাজ্যে চালু হয়নি। সুযোগ বুঝে উভয় সরকারই মাঝেমধ্যে দুটি কার্ডের ব্যর্থতার খতিয়ানগুলি তুলে ধরতে যতটা তৎপর, এই কার্ডে মানুষের চিকিৎসার সুরাহা কতটা হল তা দেখার ক্ষেত্রে তারা ততটা তৎপর নয়।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই ন্যাশনাল হেলথ স্কিম অর্থাৎ এই ধরনেরই বিমা প্রকল্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবা সরকারগুলি দিচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশ্বে প্রথম চালু হয় সকল মানুষের জন্য স্বাস্থ্যনীতি, যার মাধ্যমে সরকার দেশের সমস্ত মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্বাস্থ্যের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করত। সমাজতান্ত্রিক শিবির যতদিন ছিল বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলি কিছুটা হলেও সর্বজনীন স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে বাধ্য হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতিতে বর্তমানে সমস্ত মানুষের জন্য ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা আজ আর বিশ্বে কোথাও নেই। আমাদের দেশেও এই ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা যতটুকু চালু হয়েছিল আজ বহুলাংশেই তা ধ্বংস করা হয়েছে। একদা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় গড়ে ওঠা স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগুলি সরকার আজ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দিচ্ছে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ নীতির মাধ্যমে। এর ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেশিরভাগ অংশই আজ বেসরকারি মালিকের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। যতটুকু অংশ বেঁচে আছে তার সবটুকুই নানা ধরনের স্বাস্থ্য বিমা কোম্পানির অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হিসেবে উন্মুক্ত করা হচ্ছে। আমাদের দেশে বহু সরকারি-বেসরকারি বিমা কোম্পানি রয়েছে যারা কর্পোরেট হাসপাতালগুলিতে থাবা বসিয়ে রেখেছে। হেলথ ইন্সিওরেন্স ছাড়া বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালে নগদ টাকায় চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা আজ দেশের প্রায় কোনও মানুষেরই নেই। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তারা মোটা অঙ্কের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। একটা বিরাট অংশের মানুষের হাতে টাকা না থাকার ফলে তারা মাঝারি ও নিম্নমানের বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলিতেও চিকিৎসা করাতে অপারগ হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে সরকার ওইসব নার্সিংহোমের বিল মেটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বাস্থ্য সাথী বা আয়ুষ্মান ভারতের মতো সরকারি উদ্যোগে বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চালু করে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের নীতির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই সরকারি হাসপাতালের একটা বিরাট অংশের পরিষেবা বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে সরকারি হাসপাতালেও চিকিৎসা পরিষেবা আজ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। উপরন্তু সরকারি হাসপাতালের পরিকাঠামোর যে দৈন্যদশা তৈরি করা হয়েছে কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হবে। ইতিমধ্যে ভোটের চটকদার রাজনীতির স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল বিল্ডিং তৈরি করে সেখানে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে ওইসব হাসপাতালগুলি থেকে একটি গ্রামীণ হাসপাতালের ন্যূনতম পরিষেবাও মিলছে না। কারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রায় ৯০ ভাগ পদই শূন্য রাখা হয়েছে। মেডিকেল কলেজের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে, তার কোথাও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর পঞ্চাশ শতাংশও নেই। সম্প্রতি জানা গেছে, প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি সিনিয়র চিকিৎসকের পদ শূন্য পড়ে রয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে গ্রুপ ডি এবং সুইপারের পদ, যার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই ফাঁকা। ফলে কিছু হাসপাতালে ডাক্তার নার্স থাকা সত্ত্বেও অপারেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জরুরি পরিষেবা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা বহুলাংশে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার ফলে তা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এইভাবে সরকারি হাসপাতালগুলি ইতিমধ্যেই চিকিৎসার অনুপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রাজ্য সরকার তো ক্ষমতায় আসার পরেই ২০১১ সালে ঘোষণা করেছিল সমস্ত মানুষের জন্য হাসপাতাল থেকে ফ্রি চিকিৎসা দেওয়া হবে। চিকিৎসা যদি ফ্রি হবে তাহলে আর স্বাস্থ্য সাথী কার্ড কিসের জন্য? যেখানে বর্তমানে মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড বাধ্যতামূলক করার আগে সরকারি হাসপাতালে যতটুকু চিকিৎসা পরিষেবা ফ্রিতে পাওয়া যেত আজ সেটুকু পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হচ্ছে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। তারপরেও কি সমস্ত চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে? সম্প্রতি কলকাতার প্রিমিয়ার হাসপাতাল এসএসকেএম-এ উডবার্ন-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু করা হয়েছে যেখানে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা পেতে হয়। এই ওয়ার্ডে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের প্রয়োগ কিন্তু খুবই সীমিত। ফলে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড কি তাহলে মানুষের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা-বঞ্চনার সুরাহা করতে পারছে, নাকি আরও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার আরও কেড়ে নিচ্ছে?

অন্যদিকে জনসংখ্যা বাড়লেও সরকারি হাসপাতালে বেডের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। বর্তমানে জনসংখ্যার নিরিখে রাজ্যে তিন লক্ষের উপরে হাসপাতাল বেড প্রয়োজন। যেখানে রয়েছে মাত্র ৯০ হাজার, তার মধ্যেও একটা বড় অংশের বেড অকার্যকরী অবস্থায় পড়ে থাকে। যতটুকু বেড বা পরিষেবা রয়েছে অবাধ দালাল রাজ এবং দুর্নীতি ও অরাজকতা চলার ফলে সেই পরিষেবাটুকুও আমজনতা সুষ্ঠুভাবে পাচ্ছেন না। সহজেই অনুমান করা যায় বেডের এই সঙ্কট, পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অপ্রতুলতা থাকার দরুন স্বাস্থ্য সাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও বহু মানুষ প্রতিদিনই সরকারি হাসপাতালেও ভর্তি হতে পারছেন না বা চিকিৎসা পাচ্ছেন না। বিনা চিকিৎসাতেই তাদের মৃত্যুর মুখে পড়তে হতে হচ্ছে।

গরিব ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রাথমিকভাবে এই কার্ডটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং মানুষের ভরসা অর্জন করেছিল। প্রথম দিকে বেশ কিছু চিকিৎসা আপাত অর্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেসরকারি হাসপাতালে এই কার্ডের বিনিময়ে পাওয়ার সুযোগ পেয়ে মানুষ যারপরনাই আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের এই সুযোগ বহুলাংশে সংকুচিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি অর্থোপেডিক্স-এর প্রায় সমস্ত অপারেশনই স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। হাইড্রোসিল, হার্নিয়া, পাইলস, ফিস্টুলার মতো অত্যন্ত সাধারণ অপারেশন যা গ্রাম বাংলার মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন, সে সব অপারেশনও এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ রকমই প্রকাশ্যে বহু চিকিৎসা পরিষেবাকে ইতিমধ্যেই এই বিমার বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। অর্থাৎ এই সব ক্ষেত্রে মানুষ বর্তমানে নার্সিংহোমগুলোতে স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পাচ্ছেন না। উপরন্তু স্বাস্থ্য সাথী কার্ডকে সরকারি হাসপাতালে বাধ্যতামূলক করার ফলে সরকারি হাসপাতাল থেকেও এইসব চিকিৎসা পেতে মানুষকে ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে। এ ছাড়াও যেসব পরিষেবা মানুষের পাওয়ার কথা সে সব পরিষেবাও কি মানুষ সব সময় পাচ্ছেন? অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড-এর মাধ্যমে ভর্তির ক্ষেত্রে নার্সিংহোমগুলো রোগী ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। তার পেছনেও যে কারণ রয়েছে স্বাস্থ্য সাথী বিমার বিপুল অংকের টাকা একদিকে যেমন সরকারি বদান্যতায় এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে নয়ছয় হয়, তেমনই রাজ্য সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানের বিপুল অঙ্কের বকেয়া বিল না মেটানোর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি আর নতুন করে স্বাস্থ্য সাথীর রোগী ভর্তি করতে চায় না। ফলে সুপারিশ না থাকলে বা দাদা-দিদির আশীর্বাদ না থাকলে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড-এর মাধ্যমে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়াও আজ দুরূহ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে বেডের অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা থাকায় সেখানেও মানুষ ভর্তি হতে পারছেন না। ফলে বহু মানুষ প্রতিদিনই কার্যত বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে স্বাস্থ্য সাথী খাতে প্রতি বছরই দু'হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি বাজেট বরাদ্দ করা হয়। রাজ্য সরকার দাবি করছে এ যাবৎ স্বাস্থ্যসাথীতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকার ১৩ হাজার কোটি টাকার বিল মিটিয়েছে। যার দ্বারা এক কোটিরও বেশি মানুষ চিকিৎসা পেয়েছেন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে মানুষ দেখতে পায় স্বাস্থ্য সাথী বেডে ভর্তি হতে যেমন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তেমনি অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধ ও সরঞ্জাম দিয়ে চিকিৎসার ভুরি ভুরি উদাহরণও রয়েছে। নানা অছিলায় যেসব চিকিৎসা দু-তিনদিনে সম্ভব তার মেয়াদকাল বাড়িয়ে এক সপ্তাহ-দু সপ্তাহ পর্যন্ত করে দেওয়া হচ্ছে। বহু রোগীর ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল কেয়ার প্রয়োজন না থাকলেও তাদেরকে ক্রিটিকাল কেয়ারে ভর্তি করা হচ্ছে। আবার রোগী সুস্থ হওয়ার আগেই তাকে ছুটি নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন না থাকলেও তা করানো হচ্ছে। অপ্রয়োজনে বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসার বিল তৈরি করা হচ্ছে। এসবই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই খরচ হওয়া রাজ্য কোষাগারের ১৩ হাজার কোটি টাকার মধ্যে ঠিক কতটা অংশ মানুষের সুষ্ঠু পরিষেবার জন্য কাজে লেগেছে আর কতটা অংশ অসাধু ব্যবসায়ীদের এবং রাজনৈতিক ও অসাধু প্রশাসনের পকেটস্থ হয়েছে। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বাস্থ্যের জন্য সামগ্রিক বাজেট বরাদ্দ কখনওই কুড়ি হাজার কোটি টাকার ওপরে যাচ্ছে না। যা সামগ্রিক বাজেটের ৬ শতাংশেরও কম, অথচ একটা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে রাজ্যের স্বাস্থ্য বাজেটে মোট বরাদ্দের কুড়ি শতাংশ হওয়ার কথা। তার উপরে স্বাস্থ্য সাথী খাতে ব্যয় করার জন্য মূল স্বাস্থ্য বাজেট প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যে টাকা দিয়ে সকলের জন্য ফ্রি চিকিৎসার যে বুনিয়াদি পরিষেবা চালু ছিল তাকে ঢেলে সাজানো যেত। সরকার সে পথে না হেঁটে কেন্দ্রীয় সরকারের কায়দায় বিমানির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর জোর দিল, যা আদতে মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্য বঞ্চনারই শামিল।

বিমা নির্ভর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, তা বেসরকারি কিংবা সরকারি বিমাই হোক না কেন তা কখনও মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দিতে পারে না। তা কখনও সকলের জন্য স্বাস্থ্যের বিকল্প রাস্তা হতে পারে না। কারণ বিমা মানেই মানুষের সাথে প্রতারণা। এখানে বিমা কোম্পানি অথবা এর সাথে সংযুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি কিংবা ব্যবসায়ীদের মুনাফাকেই সুনিশ্চিত করা হয়, সেখানে মানুষের ফ্রি চিকিৎসার বিষয়টা গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার, কেউই প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না, বরং তা প্রতি বছর কমিয়ে বিমা নির্ভর এইসব প্রকল্প— তা কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত হোক বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সাথী— এই সব প্রকল্পভিত্তিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে, যেখানে সাধারণ মানুষের কোনও স্বার্থ নেই।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27
গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 24 Bengali Weekly January 23, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে সিবিআই অভিযান

দীর্ঘ ১৭ মাস পর যখন অভয়ার ন্যায় বিচার না পেয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ, হতাশ সেই সময় ‘ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইমেন’-এর পক্ষ থেকে ১৫ জানুয়ারি কলকাতা সিবিআই দপ্তরে ৫ শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের সদস্যরা যোগদেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন আরজিকর আন্দোলনের নেতা ডাক্তার অনিকেত মাহাতো। ভয়েস অফ অভয়া ভয়েস অফ উইমেন-এর সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বক্তব্য রাখেন। প্রতিনিধি দল সিবিআই-এর ইনভেস্টিগেটিং অফিসার সীমা পাহুযার কাছে স্মারকলিপি দেয় ও তাঁকে প্রশ্ন করে যে, সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট আর কবে পাওয়া যাবে? উনি এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। বরং উনি বলেন, কোনও একদিন নিশ্চয়ই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট বেরোবে। প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলা হয়, যে ভাবে এই তদন্ত নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সিবিআইয়ের মতো সংস্থার উপর আর কোনও ভরসা ও আস্থা থাকতে পারে কি?

সিবিআই কোন চাপের কাছে নতিস্বীকার করছে—এ প্রশ্নও করেন তাঁরা।

রায়দিঘিতে কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহক আন্দোলনের জয়

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় রায়দিঘি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের অধীন এলাকার বোরো চাষিরা চাষের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন না। অস্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের দাবিতে ২৪ ডিসেম্বর ও ৫ জানুয়ারি বিক্ষোভ দেখান তারা। রায়দিঘি বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার চাষিদের বলেন, দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে।

চাষিরা তারপরও বিদ্যুৎ সংযোগ না পাওয়ায় ১৪ জানুয়ারি আবার বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করেন চাষিরা। রায়দিঘি, কঙ্কনদিঘি, নগেন্দ্রপুর, কুমড়োপাড়া, নন্দকুমারপুর প্রভৃতি এলাকার বিদ্যুৎ গ্রাহক ও কৃষকদের লাগাতার ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চাপে স্টেশন ম্যানেজার সমস্ত চাষিদের জানান— তারা আজ থেকে টেম্পোরারি কানেকশনের মাধ্যমে এক সপ্তাহের মধ্যে মাঠে জল দিতে পারবেন, যাদের নিজস্ব জমি তাদের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে, যারা অন্যের জমিতে চাষ করেন, তাদের জমির মালিকদের কাছ থেকে লিখিত কাগজ দিতে হবে।

বিদ্বেষের সর্বনাশা রাজনীতি

ছয়ের পাতার পর

বহু মানুষের দানে গড়ে উঠেছিল। সেখানে কোনও ধর্ম-বর্ণ দেখা হয়নি। সব ধর্মের ছাত্ররা সেখানে পড়ার সুযোগ পেত। কারণ, তখন শিক্ষার বিস্তারই ছিল লক্ষ্য। আজ নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে শাসক দলগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে ধর্মকে। পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ-বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার চূড়ান্ত লঙ্ঘন হচ্ছে এর মাধ্যমে।

জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিলের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ ‘নয়া কাশ্মীর’-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই কি তাদের নয়া কাশ্মীর, যেখানে ছাত্রদের মেধা নয়, ধর্মীয় পরিচয়ই প্রাধান্য পাবে! কঠিন পরিশ্রমের ফল হিসাবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা ওই কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছিল, তারা হয়ত কিছুদিন পর আর কোনও কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে, কিন্তু তারা কি ভুলতে পারবে কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ শুধুমাত্র ঘৃণ্য সংখ্যালঘু বিদ্বেষ?

বিজেপি-আরএসএসের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বলি তারা। এই দগদগে ক্ষত মুছবে কী দিয়ে? বিজেপি-আরএসএসের এ ভাবে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে, গোটা জাতিকে কলঙ্কিত করা থেকে বিরত করতে পারে শিক্ষাপ্রেমী মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলন। এদের বাড়বৃদ্ধি জাতির জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে গণতন্ত্রপ্রিয় ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানুষকেই।

শহিদ আমির আলি হালদার স্মরণ দিবস

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিশিষ্ট জননেতা এবং কৃষক সংগঠন এআইকেকেএমএস-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক ও দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড আমির আলি হালদার ১৯৯৮ সালের ১১ জানুয়ারি সিপিএম ঘাতক বাহিনীর হাতে নৃশংস ভাবে খুন হন। গত ১১ জানুয়ারি দোলতলা মাঠে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ও বারুইপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। এ দিন জয়নগরের বাইশহাটায় লোকাল অফিস উদ্বোধন করেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

ছত্তিশগড়ে এন আর এল এম কর্মীদের বিক্ষোভ

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে ১২টি জেলার শত শত মহিলাকর্মী বিক্ষোভ দেখালেন। এই বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এআইইউটিইউসি অনুমোদিত এনআরএসএলএম ‘কৃষি সখী পশু সখী সংঘ’ ১৫ জানুয়ারি সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির দাবিতে। এই কর্মীদের রাজ্য সরকার মাসে মাত্র ১৯১০ টাকা ভাতা দেয়। কিন্তু কাজের প্রয়োজনে তাঁদের পকেট থেকেই খরচ করতে হয় ৫ হাজার টাকার বেশি।

এআইইউটিইউসি নেতা বিশ্বজিৎ হারোড়ে বলেন, মন্ত্রী, এমএলএ, এমপিদের লক্ষ লক্ষ টাকা ভাতা দেয় সরকার, অথচ সাধারণ কর্মীদের টাকা দিতে তারা নারাজ। বিক্ষোভে দাবি জানানো হয় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি এই কর্মীদের দিতে হবে। বিক্ষোভের পর মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভানেত্রী ঐশ্বর্যা রায়, সাধারণ সম্পাদক রামেশ্বরী রাজপুত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ইতিহাস লেখার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

তিনের পাতার পর

রীতি পালন করত, তেমনই ইরানীয় আর্যরা পালন করত ‘হোম’ রীতি। প্রসঙ্গত ইরানি ভাষায় ‘স’-এর উচ্চারণ না থাকায় তা বদলে গিয়ে ‘হ’-এ পরিণত হয়। একই ভাবে ভারতের সিন্ধু নদ ইরানি ভাষায় হয়ে যায় ‘হিন্দু’ এবং সিন্ধু নদের অপরপ্রান্তে সকল অধিবাসীই তাদের কাছে হিন্দু নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ হিন্দু কোনও ধর্মীয় সংজ্ঞা নয়, বরং এটি একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। ভাষাগত এই সাদৃশ্য ঋকবেদে এবং জেন্দ-আবেস্তা-র মধ্যেও দেখা যায়।

পুরুষতান্ত্রিকতা

সিন্ধু হোক বা হিন্দু—ইন্দো-আর্য সংস্কৃতিতে পুরুষতান্ত্রিকতা ছিল প্রবল। রোমিলা থাপার দেখিয়েছেন যে ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্র নারীদের কোনও স্বাধীনতাই দিত না। জীবনের প্রতি পর্যায়েই তাদের পুরুষের অধীন করে রাখা হয়েছিল— বিবাহের পূর্বে পিতার অধীনে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে, বিধবা অবস্থায় পুত্রের অধীনে। যদিও এর ব্যতিক্রম রয়েছে। সে যুগেও প্রভাবতী গুপ্তার মতো নারী তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র সাবালক না হওয়ায় রানি হিসেবেই রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। দক্ষিণ ভারতের অন্দাল, কাশ্মীরের লাল দেদ এবং রাজস্থানের মীরাবাই-এর মতো সাধিকারা ভক্তিধর্ম প্রচার করেছেন। তবে তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম মাত্র। বৃহত্তর নারী সমাজের উপর তাঁরা তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। পরবর্তী কালেও মুঘল এবং রাজপুতদের মধ্যে বৈবাহিক সন্ধিগুলোর ক্ষেত্রেও মেয়েদের সম্পত্তি হিসেবেই গণ্য করা হত।

পরিবর্তনশীলতা

ইতিহাস বিকৃতির এই অন্ধকারময় দিকগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি রোমিলা থাপার এ কথাও স্বীকার করেছেন যে, কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তাঁর ভাষায়, ‘আমার দীর্ঘ জীবনে আমি যদি কিছু শিখে থাকি তা হল কোনও কিছুই চিরকাল স্থায়ী হতে পারে না। কোনও একটা সময়ে যা সঠিক বলে মনে হয় পরবর্তী কালে সময়ের প্রয়োজনে সেটিও পরিত্যক্ত হয়। এই পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করতেই হবে।’

Editor : Amitava Chatterjee ▪ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ▪ Phone: 9433451998, 9432889347 ▪ E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com